বিবেকপ্রসঙ্গ

বিবেকানন্দ : প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এক সেতু

স্বামী চেতনানন্দ

সারা পৃথিবী জুড়ে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশততম জন্মোৎসব পালন করছি। তিনি কেমন ছিলেন? শারীরিকভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, মানসিকভাবে অতীব ধর্মভাবাপন্ন, নীতিনিষ্ঠ ও মূল্যবোধসম্পন্ন। তাঁর ছিল প্রবল ইচ্ছাশক্তি, বিশাল হৃদয়। মিথ্যাচার ও কাপুরুষতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, যা তাঁকে শিখিয়েছিল : ''Do not accept anything without evidence''। সত্যের প্রতি ছিল তাঁর তীব্র অনুরাগ।

তিনি কৈশোরে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন। কেন? হিন্দুদের ছুঁতমার্গ, পৌত্তলিকতা, বাল্যবিবাহ, সাধারণ মানুষের ওপর পুরোহিততন্ত্রের শোষণ—কোনওটাই তিনি পছন্দ করতেন না। নারীশিক্ষার প্রসার এবং জাতপাতের বিলোপ ছিল তাঁর একান্ত বাসনা। তাই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। স্বামীজী বলেছেন, চার শ্রেণির মানুষ সমাজকে শোষণ করে। প্রথমত, আদিযুগে যখন শারীরিক শক্তিই ছিল শেষ কথা তখন শক্তিশালী মানুষরা শোষণ করত; দ্বিতীয়ত ধনীরা শোষণ করে; তৃতীয়ত বুদ্ধিজীবীরা; আর চতুর্থ শোষক হল পুরোহিততন্ত্র। বেদান্ত শোষণ বরদাস্ত করে না, সে সাম্যবাদের শিক্ষা দেয়।

এখানে চারটি বিষয় লক্ষণীয়। সাকারবাদে বিবেকানন্দের একেবারেই বিশ্বাস ছিল না। খ্রিস্টধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মে ঈশ্বরের ধারণা—ঈশ্বর নিরাকার কিন্তু সগুণ। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান, কৃপালু, কিন্তু তাঁর কোনও আকার নেই। স্বামীজী এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন, এবং এই বোধের ভিত্তিতেই ধ্যান করতেন। তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন—মা কালীকে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে ঘৃণা করতাম। কিন্তু সে-মেয়ে আমার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে আমাকে তার ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলল। রামকৃষ্ণদেব আমাকে মা কালীর কাছে নিবেদন করেছিলেন।

স্বামীজী মা কালীর কাছে পাঁচটি জিনিসের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—মা আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, আর অবাধ দর্শন দাও। মা কালীকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় যে-বিষয় স্বামীজীর অপছন্দ ছিল সেটি হল গুরুবাদ। পরে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। লেখেন, 'যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্'। এভাবেই স্বামীজী তাঁর গুরুর গুণকীর্তন করেন।

তৃতীয়ত, তিনি অবতারবাদ বিশ্বাস করতেন না। অথচ পরবর্তী কালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছেন,

'অবতারবরিষ্ঠ'। শুধু তাই নয়, তিনি 'ভক্তিযোগ' বক্তৃতামালায় ঈশ্বরের দেহধারণ করার কথা বলেছেন।

অদ্বৈতবাদেও স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল না। 'ঘটি ব্রহ্ম, বাটি ব্রহ্ম' বলে তিনি মশকরা করেছিলেন। তারপর ঠাকুরের স্পর্শে তাঁর অদ্বৈতানুভূতি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজীর সম্পর্কের মাঝে আর একটি লক্ষণীয় বিষয়, ঠাকুর কখনও স্বামীজীর ওপর জোর খাটাননি; তাঁর সঙ্গে তর্ক করেননি। তিনি শুধু পথ দেখিয়েছেন যুক্তি ও অনুভূতি দিয়ে। এজন্য স্বামীজী পরে প্রায়ই বলতেন, ''উপলব্ধিই ধর্ম''। শাস্ত্র দিয়ে শাস্ত্রকে খণ্ডন করা যায়, যুক্তি দিয়ে যুক্তিকে। কিন্তু উপলব্ধিকে খণ্ডন করা অসম্ভব। চিনির স্বাদ মিষ্টি। এখন আমি যদি বিরাট এক রচনা লিখে প্রতিপন্ন করতে চাই যে চিনির স্বাদ আদতে টক বা তেতো, আপনারা কি তা মেনে নেবেন? কখনই না। ওভাবে কিছু করাই যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই উপলব্ধি। মনে পড়ছে, ১৯৯২ সালে স্পেনের আভিলা-য় সাম্প্রতিক অতীন্দ্রিয়বাদ (Contemporary mysticism) নিয়ে বলার জন্য আমায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। আভিলা সেন্ট টেরেসার জন্মস্থান। আমি বলেছিলাম, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জোর দেওয়া হত যুক্তিবাদের ওপর, বিংশ শতাব্দীতে মানবতাবাদের ওপর। ধর্ম যদি মানুষকে সাহায্য করতে না পারে, তবে ধর্মের সার্থকতা কোথায়? একবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে অতীন্দ্রিয়বাদের ওপর। ইদানীং মানুষ বলছে—আমরা ঢের পড়েছি, ঢের শুনেছি, এবার আমরা নিজেরা অনুভূতি লাভ করতে চাই। এদিক থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এই শতাব্দীতে নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বিবেকানন্দের পরিবর্তন সত্যই বিস্ময়কর। তিনি বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের মনকে কাদার তালের মতো দুমড়ে মুচড়ে যেমন খুশি রূপ দিতে পারেন। ক্রিস্টোফার ঈশারউড মন্তব্য করেছেন, বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তি যখন পরিবর্তিত হয়ে যান তখন গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীই পরিবর্তিত হল। আসলে একজন মহান ব্যক্তির মনের দ্বিধাগুলি থাকে বৃহৎ, সেগুলির পরিবর্তনও হয় বিপুলভাবে এবং পরিবর্তনের প্রভাবও হয় ব্যাপক।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর স্বামীজী গোটা ভারত ভ্রমণ করেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়ে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সেতু বাঁধার এ ছিল এক চমৎকার সুযোগ।

প্রথমে পাশ্চাত্যে গিয়ে স্বামীজীকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। রাস্তাঘাটে বিদ্রূপ, এমনকী শারীরিক নির্যাতন! রেস্তোঁরাও তাঁকে খাবার বিক্রি করতে চায়নি বর্ণবিদ্বেষের জন্য! এক বক্তৃতা-সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হলেন তিনি। বক্তৃতা পিছু স্বামীজী তখন সাতাশশো ডলার করে আয় করতেন। কিন্তু তারা তাঁকে দিত মাত্র একশো ডলার। এতটা খারাপভাবে তাঁকে ঠকানো হত। আমি বলতে চাইছি, সেতুবন্ধনের কাজটা কতটা কঠিন ছিল! ডেট্রয়েট-এ স্বামীজীকে লড়াই করতে হয়েছে মিশনারিদের সঙ্গে। স্বামীজী বলেছিলেন, খ্রিস্টকে বাদ দিয়ে প্রাসাদে বাস করার চেয়ে খ্রিস্টের সঙ্গে রাস্তায় কম্বল সম্বল করে কালাতিপাত করা শ্রেয়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা মিথ্যা রটনা করে তারা আমেরিকানদের ধোঁকা দিয়ে অর্থ আদায় করত। বলত, ভারতে মায়েরা তাদের সন্তানদের কুমিরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, জগন্নাথদেবের রথের তলায় অনেকে ঝাঁপ দেয়।

এইসব প্রশ্ন উঠলে স্বামীজী রঙ্গ করে তার উত্তর দিতেন। —আমার মা আমাকেও কুমিরের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার মতো

কেলেকুলো ছেলেকে কুমির খায়নি। অথবা, —হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি শুনেছি মেয়েদের কুমিরের মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, ওদের শরীর এত নরম-সরম যে কুমিররা মেয়েদের খেতে খুব ভালবাসে। সেজন্য জানেন ম্যাডাম, এখন ভারতে কী হয়েছে? এখন পুরুষদের গর্ভে সব বাচ্চা জন্মাচ্ছে।

এভাবে যখন মিশনারিদের মুখোশ খুলে গেল, তাদের রোজগার গেল পড়ে। তারা কফিতে বিষ মিশিয়ে স্বামীজীকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল পর্যন্ত, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় বেঁচে গেলেন।

মিনিয়াপোলিস থেকে তিনি শিকাগোয় যাচ্ছেন। পথে একজন বললে—তুমি কোথা থেকে আসছ?

—ভারতবর্ষ থেকে।

—ভারতবর্ষ? আমি জীবনে ভূগোল পড়িনি। জায়গাটা সম্পর্কে আমায় কিছু বলো।

—সে-দেশ তোমাদের দেশের ঠিক উলটোদিকে।

—ওঃ, তবে তো তুমি বিধর্মী—হিদেন!

—হ্যাঁ, লোকে আমায় তেমনটাই বলে।

—তবে তোমায় নরকাগ্নিতে যেতে হবে।

—দেখো, তোমাদের দেশে যখন মাইনাস ২০ ডিগ্রি তাপমাত্রা হয় তখন তোমাদের তেমন কোনও বিকার হয় না, তোমাদের কিছু মনেও হয় না। আমাদের দেশে গরমে তাপমাত্রা হয়ে যায় ১১০ ডিগ্রি। নরককুণ্ড নিয়ে আমার তাই তেমন কোনও মাথাব্যথা নেই।

স্বামীজী নানারকম মজা করতেন। এরকম একটি ক্ষেত্রে একবার স্বামীজী বললেন—আমি না হয় নরকে যাব, কিন্তু তোমার কোথায় স্থান হবে?

—আমি স্বর্গে যাব।

—তবে তো আমাকে নরকে যেতেই হবে, তোমার সঙ্গে বাস করতে আমার ইচ্ছে নেই।

আমেরিকা এক নতুন দেশ। সেখানে সবাই নতুনের প্রেমিক। ধর্মমহাসভায় তারা স্বামীজীর কাছ থেকে নতুন কিছু শুনেছিল। একবার এক ইহুদি ভদ্রলোক স্বামী নিখিলানন্দকে বলেছিলেন—আমি ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে সকল বক্তা তাঁদের নিজের নিজের ধর্মমতের প্রতিনিধিত্ব করেন। একমাত্র এই তরুণটি উঠে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সর্বজনীন ধর্মের কথা বললেন। অন্য ধর্মের প্রতিনিধিরা যেন একতারা বাজিয়েছিলেন—একটি তারের সুর। স্বামীজী বাজিয়েছিলেন অনেক তারে সমৃদ্ধ বীণা। তিনি এক নতুন সুর সৃষ্টি করলেন, আর সৃষ্টি করলেন নানা ধরনের রাগ আর রাগিণী। অন্য বক্তাদের সঙ্গে এখানেই স্বামীজীর পার্থক্য।

কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল—আপনি কি তখন কোনও জাদু করেছিলেন?

—না, বাল্যকাল থেকেই আমি খুব পবিত্র। কোনও খারাপ ভাব বা চিন্তা কখনও আমার মাথায় আসত না। সেজন্যই আমার পবিত্রতা শ্রোতাদের অভিভূত করেছিল এবং আমার বক্তৃতা মানুষকে মুগ্ধ করেছিল। আমি কোনও জাদু করিনি।

এই হলেন বিবেকানন্দ।

ইংরেজ কবি রুডইয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬)-এর 'ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' কাব্যে আমরা পড়েছি : বিধাতার মহান বিচারাসনে পৃথিবী ও মহাকাশ যতদিন স্থিতাবস্থায় আছে, প্রাচ্য ততদিন প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য ততদিন পাশ্চাত্যই থাকবে, উভয়ের মিলন অসম্ভব। কিন্তু পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই বলবান মানুষ যখন পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ান তখন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, দেশের সীমা, বংশগতি বা জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কিত সব প্রশ্নই অবান্তর হয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ তেমনই এক বলবান পুরুষ যিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যাবতীয় বাধা আর সীমা ভেঙে দিয়েছিলেন। বর্তমান যুগে টেলিভিশন, ইন্টারনেট, স্কাইপ, ফেসবুক, আইপ্যাড, আইপড, স্মার্টফোন পৃথিবীর সব বেড়া ভেঙে দিয়েছে। ছোট্ট আইপ্যাডে আপনি বিশ্বদর্শন করতে পারেন।

গত গ্রীষ্মে (২০১২) আমি লন্ডনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক দেখছিলাম। প্রতিটি দেশ তাদের জাতীয় পতাকা বহন করে কেমন অলিম্পিক ভিলেজ-এর চারধারে মার্চ করছিল। ওই ছোট্ট জায়গায় বিশ্বমৈত্রীর বোধ জাগ্রত হয়। গোটা পৃথিবী সেখানে উপস্থিত! যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্। ধর্মের মধ্যেও তেমনি ঐক্যসঞ্চারের ক্ষমতা রয়েছে। 'রিলিজিয়ন' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'religio' শব্দটি থেকে, যার মানে মানব ও দেবতার মাঝে বন্ধন; বা 'religare' শব্দটি থেকে, যার মানে ঈশ্বরের সঙ্গে বাঁধা।

পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের সামনে ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার আর মৌলবাদের সংকীর্ণতা মোকাবিলা করা। সূর্য পূর্বদিকে ওঠা মানে পূর্বদিক থেকে আলো আসা। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের পদার্পণের আগে সেখানের প্রেক্ষাপটটি জেনে নেওয়া দরকার। সেখানে প্রাচ্যের দর্শন আগেই এসে পৌঁছেছিল। এমারসন, থোরো, চানিং, হুইটিয়ার, অলকট, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি এই নতুন মহাদেশে আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৪২ সালে 'আমেরিকান প্রাচ্য সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এমারসন ও থোরো দুজনেই স্বপ্ন দেখতেন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনে এক নতুন সংস্কৃতি জন্ম নেবে। মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে এক নতুন পদক্ষেপ শুরু হবে।

কিন্তু নানা কারণে সে-মিলন তখন বাস্তবায়িত হয়নি। ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের আওতায় চলে আসে। ১৮৪৯ সালে শুরু হয় মার্কিন স্বর্ণ-অভিযান। ১৮৬০ সালে এব্রাহাম লিঙ্কনের আমলে আরম্ভ হয় গৃহযুদ্ধ। আমেরিকার মানুষ নতুন ধারণা, নতুন ভাবনাকে পছন্দ করে। খেয়াল করবেন, আমেরিকায় নতুন চিন্তা কখনও কখনও পূর্ব উপকূল থেকে শুরু হয়, আবার কখনও শুরু হয় পশ্চিম উপকূলে।

পশ্চিমে বেদান্ত ভাবনা কী করে প্রবেশ করল? সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহাজাদা দারা শুকোর বদান্যতায় পঞ্চাশটি উপনিষদ সংস্কৃত থেকে পার্সি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। অ্যানকোয়েটিল-ডুপাররন নামে এক ফরাসি পণ্ডিত ১৮০১-০২ সালে এই উপনিষদগুলিকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার এগুলি পাঠ করেছিলেন। উপনিষদ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ম্যাক্সমুলার এবং পল ডয়সন পশ্চিমে এই প্রাচ্য ভাবনার প্রচার ঘটিয়েছিলেন। ১৮৪৬ সালে চার্লস উইলকিন্স গীতার অনুবাদ করেন। এমারসন এই অনূদিত গীতার একটি কপি কার্লাইলের কাছ থেকে উপহার-স্বরূপ পেয়ে তার ভিত্তিতে 'দ্য ব্রহ্ম' নামে এক কবিতা এবং অপর একটি নিবন্ধ রচনা করেন। এই দুই রচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এডউইন আর্নল্ড লেখেন 'লাইট অফ এশিয়া'। পাশ্চাত্যে প্রাচ্য ভাবধারা আগমনের এই হল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। সুতরাং ভিত একটা তৈরি ছিল। কিন্তু তা ছিল বৌদ্ধিক স্তরে।

আমেরিকানরা অনেক মুক্তমনা, অনেক খোলামেলা। স্বামীজী পাশ্চাত্যে ছিলেন পাঁচ বছর। প্রথমবার সাড়ে তিন বছর আর দ্বিতীয়বার দেড় বছর। শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ পাশ্চাত্যে আসেন। ভারত ও মার্কিন—দুই দেশের মধ্যে সেইসময় যে-বৈপরীত্য বিরাজ করত তার এক পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরেছেন স্বামী নিখিলানন্দ : প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন ছিল অত্যন্ত কঠিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক; ভারত ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। আমেরিকায় তখনই সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তার সম্ভব হয়েছে; ভারতে সেইসময় বড়জোর দশ শতাংশ মানুষ লিখতে পড়তে জানত। আমেরিকানরা ধনাঢ্য এবং সমৃদ্ধিশালী; আর নব্বই শতাংশ ভারতীয়ের দুবেলা খাবার জুটত না। অ্যাংলো-স্যাক্সন ধারার ঐতিহ্য মেনে আমেরিকানরা, বিশেষত শ্বেতাঙ্গ

মার্কিনরা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকার পেতে অভ্যস্ত; ওদিকে জাতপাত, পুরোহিততন্ত্র ও ধনবান জমিদারদের অত্যাচারে হিন্দুরা পদানত। মার্কিন নারীরা সামাজিক স্বাধীনতা ও প্রযুক্তির সুবিধে লাভ করেছেন, যা ভারতীয় মহিলারা একেবারেই পাননি।

সাধারণ মানুষের অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করতে আমেরিকায় ধর্ম, সরকার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সব একযোগে চেষ্টা চালিয়েছিল; আর ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য তখন অনেক সময় ধর্ম ও সমাজসংস্কারকে কাজে লাগানো হত। ভারতীয় ঐতিহ্য এক উচ্চ বৌদ্ধিক স্তরে উন্নীত; আর আমেরিকানরা আবেগতাড়িত। হিন্দুরা কল্পনাবিলাসী এবং অনুমাননির্ভর; মার্কিনরা প্রয়োগমুখী এবং বাস্তববাদী। ইউরোপে উনিশ শতকে যে-রোম্যান্টিক ভাবকল্পনা প্রাধান্য পেত, মার্কিন দর্শনের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল তার ঠিক বিপরীত।

আমেরিকার শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের স্থান সীমিত, অনেকটাই পুঁথিগত। সেই সীমান্ত-বাসের দিনগুলির ঐতিহ্য মেনে আমেরিকানরা সাধারণভাবে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, সজাগ, উপায় উদ্ভাবনে দক্ষ, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাবলীল। হিন্দুদের চিন্তাভাবনা সাধারণত জড়ত্বে আক্রান্ত। ভারতের পরিবেশ তার বস্তুগত দুর্দিনেও ধ্যানস্থ সাধু ও অতীন্দ্রিয়বাদীর জন্ম দিয়েছে। আমেরিকানরা কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করেছে। ভারতবর্ষে বুদ্ধ, কৃষ্ণ, শংকর, চৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও জাতীয় নায়কের মর্যাদা পান। পৃথিবীর সফল মানুষদের আমেরিকার জনগণ স্বীকৃতি জানায়। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতিকে নিয়ে গবেষণা করেছে সেখানে মানুষের স্থান খুঁজে নিতে এবং মানুষের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপযুক্ত শক্তি সংগ্রহ করতে। ভারতীয় দার্শনিক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চর্চা করে উপলব্ধি করেন যে এসবই মায়া এবং অন্তঃপ্রকৃতির চর্চায় মন দেন। উপরে আলোচিত এই বৈশিষ্ট্যগুলি হয়তো কিছুটা অতিসরলীকৃত, কিন্তু মূলত অনেকটাই সত্য।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে পরিণয় হওয়া কতটা শক্ত তা-ই নিয়ে আমরা কথা বলছি। আমার এক বন্ধু বলতেন—পরিণয় কাকে বলে জান? প্রথম বছর স্বামী বকবক করে আর স্ত্রী শোনে, দ্বিতীয় বছর স্ত্রী বকবক করে আর স্বামী শোনে, তৃতীয় বছর দুজনেই বকবক করে আর প্রতিবেশীরা শোনে। একেই বলে বিবাহিত জীবন।

যাই হোক, এই পরিণয় বড় শক্ত ব্যাপার। কিন্তু স্বামীজী তার অনেকটাই করতে পেরেছিলেন। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন পাশ্চাত্যের ধনী রাষ্ট্রগুলিকে বলবেন দরিদ্র ভারতবাসীদের সাহায্য কর, কিন্তু পরে তিনি বুঝলেন, ওতে কাজ হবে না। বিবেকানন্দ ভিখারি নন। তিনি দেওয়ার জন্য জন্মেছেন এবং অর্থ না থাকলেও পৃথিবীকে দেওয়ার মতো তাঁর অনেক কিছু ছিল। নিজের অভিমত জানিয়ে তিনি তাঁর মাদ্রাজি শিষ্যদের লিখেছিলেন, ''আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম; ভারতকে যদি আবার উঠতে হয়, তবে তাকে নিজ ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে পৃথিবীর সব জাতির ভিতর ছড়িয়ে দিতে হবে। সম্প্রসারণই জীবন—সংকীর্ণতাই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু। আমরা যেদিন থেকে অন্যান্য জাতিকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলাম, সেদিন থেকে আমাদের ধ্বংস আরম্ভ হল; আর যতদিন না আমরা আবার সম্প্রসারণশীল হই, ততদিন কিছুই আমাদের বিনাশ আটকে রাখতে পারবে না।''

আমাদের তাই পৃথিবীর সব জাতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। নানান কুসংস্কার আর স্বার্থপরতায় আচ্ছন্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন শত শত

মানুষ দিয়ে কোনও কাজ হবে না। বরং যেসব হিন্দু বিদেশ ভ্রমণে বেরোচ্ছেন তাঁরা তাঁদের দেশের অনেক বেশি উপকার করছেন। পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রগুলি যে চমৎকারভাবে তাদের জাতীয় জীবন গঠন করেছে, চরিত্রবল হল তার স্তম্ভস্বরূপ। আমরা বহু পরিমাণে যতক্ষণ না এসব করতে পারছি ততক্ষণ এসব শক্তির বিরুদ্ধে রাগ দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। স্বামীজী আন্দাজ করেছিলেন আমরা এমনটাই করব। সেতুবন্ধন সহজ কাজ নয়। জীবনযাত্রা, ধর্ম, শিক্ষাদীক্ষা, লালনপালন—সব দিক থেকেই পাশ্চাত্য আর আমাদের মধ্যে অনেক তফাত।

ক্রিস্টোফার ঈশারউডের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। অত্যন্ত ভক্ত মানুষ। আমি তখন হলিউডে, স্বামী প্রভবানন্দজীর শরীর ভাল না থাকায় ঈশারউড প্রতি বুধবার কথামৃত পাঠ করতেন আর আমাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। ঈশারউড স্বামীজীর পাশ্চাত্যযাত্রার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতেন, তিনি এসেছিলেন সেতু তৈরি করতে। তাঁর জীবনের এবং তাঁর পাশ্চাত্যযাত্রার অন্য আর একটি দিকও নিশ্চয় আছে, তবে স্বামীজীর আসল মহত্ত্ব তাঁর পাশ্চাত্য আগমন এবং তাঁর দেশে ফিরে যাওয়ার সুন্দর ভারসাম্যে। ভারতবর্ষ থেকে এসে তিনি এমন কথা বলেননি যে—আমেরিকার যত পাপী আছ শোনো, তোমাদের এবার পরিবর্তন ঘটবে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সকল কিছুর নিরাময়। বরং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্তুতি প্রায় কখনই করেননি। পাশ্চাত্যকে বলেছেন—তোমরা বড় বস্তুবাদী। তোমাদের অর্থ, নাম আর ক্ষমতার দাসত্ব অত্যন্ত বিরক্তিকর বিষয়। তিনি পাশ্চাত্যকে শেখালেন ভারত অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ দেশ। অনুপ্রবেশকারীরা এই দেশকে জয় করেছে বলে, বা আমেরিকার মতো প্রযুক্তিতে উন্নত হয়নি বলে ভারতবর্ষকে হেয় করা ঠিক নয়। অপরদিকে ভারতে ফিরে এসে তিনি দেশবাসীকে বলছেন, পাশ্চাত্যের উদ্দীপনার কিছুটাও যদি তোমাদের থাকত তাহলেও তোমাদের উন্নতির একটু সম্ভাবনা ছিল। তোমরা একটা পিনও তৈরি করতে পার না, আবার ইংরেজদের নিন্দে করতে চাও।

তাহলে উভয় দিকেই স্বামীজী ভারসাম্য রক্ষা করে গেছেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল, পাশ্চাত্যকে দেওয়ার মতো প্রাচ্যের যা আছে আর প্রাচ্যকে দেওয়ার মতো পাশ্চাত্যের যা আছে তার মধ্যে এক সুষ্ঠু আদান-প্রদান। কোনও সমাজই ত্রুটিশূন্য নয়। স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের যা ভাল পাশ্চাত্য তা নিক, আর পাশ্চাত্যের যা কিছু ভাল তা ভারতবর্ষ গ্রহণ করুক। এইভাবে তৈরি হবে এক ভারসাম্যের সমাজ, এক উত্তম আর আদর্শ সমাজ। এই বিষয়টিকেই স্বামীজী গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে লেখেন, ''অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দ পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।'' আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য : ''ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।''

স্বামীজী ৩০ ডিসেম্বর ১৮৯৪ 'ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর বক্তৃতায় বলেছিলেন, ''প্রাচ্যের প্রতি বুদ্ধদেবের যেমন এক বার্তা ছিল, পশ্চিমের প্রতি তেমন আমার এক বার্তা রয়েছে।'' কী সেই বার্তা? বেদান্ত। বেদান্তের সর্বজনীনতা। কোনও ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে গেলে

তিনটি জিনিস প্রয়োজন—একজন ধর্মগুরু, একটি গ্রন্থ আর একটি ব্যক্তিগত ঈশ্বর। যিশুকে বাদ দিলে, বাইবেলকে বাদ দিলে, গড-কে বাদ দিলে খ্রিস্টধর্মের আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। মহম্মদকে বাদ দিলে, কোরাণকে বাদ দিলে, আল্লাকে বাদ দিলে ইসলামধর্মের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। তাদের ধর্ম এইসব ব্যক্তি, গ্রন্থ এবং ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। বুদ্ধদেব আর ত্রিপিটককে বাদ দিলে বৌদ্ধধর্মেরও কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বেদান্ত কোনও ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। একথা সত্য যে আমাদের অনেক দেব-দেবী, কিন্তু বৈদান্তিক ঈশ্বর হলেন নৈর্ব্যক্তিক সচ্চিদানন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দের চরম রূপ।

মনে পড়ছে, আমাদের সেন্ট বারবারা কনভেন্টে একবার এক ব্যক্তি এক সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—Who is the Prophet of your organisation? (আপনাদের সঙ্ঘের প্রফেট বা ধর্মগুরু কে?) তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—It is a non-profit organisation (আমাদের সংস্থা 'নন-প্রফিট' অর্থাৎ অলাভজনক)। আমেরিকার সব চার্চই অলাভজনক সংস্থা।

আমাদের অনেক দেবতা, অনেক ধর্মগুরু—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ। আমাদের ধর্ম কোনও একটিমাত্র গ্রন্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। যে-ধর্ম কাল বা স্থান দ্বারা সীমায়িত নয়, কোন doctrine বা dogma দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় সেই ধর্মের পক্ষেই সর্বজনীন হয়ে ওঠা সম্ভব। এই কথাটিই স্বামীজী তাঁর সুন্দর ভাষায় বলার চেষ্টা করেছেন : ''আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ মাত্র।''

বেদান্তের মূল চারটি নীতি কী কী? প্রথম : আত্মার পবিত্রতা, মানুষের দেবত্ব। দ্বিতীয় : সত্যের সর্বজনীনতা। তৃতীয় : ঈশ্বরের একত্ব। চতুর্থ : বিভিন্ন ধর্মমতের মাঝে সুরসংগতি। স্বামীজী বুঝেছিলেন, বেদান্তের বীজ রোপণের পক্ষে আমেরিকা সবচেয়ে ভাল জমি। দুটি কারণে। প্রথমত, আমেরিকার মানুষ স্বাধীনতাপ্রেমী। আর দ্বিতীয় কারণ, গণতন্ত্র। তারা একনায়কতন্ত্র বরদাস্ত করে না। বেদান্তও ঠিক এই জিনিসই শেখায়। বৈদান্তিক ঈশ্বরের ধারণা এক গণতান্ত্রিক ধারণা। আপনি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর, সকলে ঈশ্বর। আর মুক্তি। মুক্তিই আত্মার মূল সুর। বেদান্তশাস্ত্রগুলির প্রতিটির শেষে রয়েছে 'জীবন্মুক্তি' নামে এক অধ্যায়। বেদান্তদর্শনের মূল লক্ষ্যই হল ওই মুক্তি।

আজ বহু আমেরিকান গ্রন্থের নির্ঘণ্ট খুঁজলে দেখা যাবে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত'। পাশ্চাত্যে বেদান্ত আন্দোলন কতটা প্রবিষ্ট হয়েছে, এটা তারই প্রমাণ। স্বামীজী এই কাজে পথিকৃৎ।

গত নভেম্বরে ক্যানসাসে আমার একটি বক্তৃতা ছিল। 'আমেরিকান বেদ' গ্রন্থের রচয়িতা ফিলিপ গোল্ডবার্গ আর আমি একই মঞ্চ থেকে বললাম। তাঁর গ্রন্থে একটি অধ্যায় আছে : 'গেরুয়া পোশাকের সেই সুদর্শন সন্ন্যাসী'। আদতে স্বামী বিবেকানন্দই আধ্যাত্মিক সেতু তৈরি করে গেছেন। পরে পরে অনেক ভারতীয় এবং ধর্মীয় সংস্থা অনেক সহজে পাশ্চাত্যে আসতে পেরেছেন, তাঁদের বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। ১৯৬৫ সালের পর থেকে ভিসা পাওয়া সহজ হয়ে যাওয়ায় আমেরিকায় এসেছে 'ইনটিগ্রাল যোগ', মহর্ষি মহেশ যোগীর 'ট্রানসেন্ডেন্টাল মেডিটেশন', ভক্তিবেদান্তের 'ইন্টারন্যাশানাল কৃষ্ণ কনশাসনেস' এবং আরও বহু গুরু ও ধর্মীয় নেতা। বহু প্রাচ্য

ধর্মমত পাশ্চাত্যে স্থান করে নিয়েছে, বিশেষত আমেরিকায়। এর জমি তৈরি করেছেন কে? স্বামীজী। স্বামীজীই পথিকৃৎ। তিনি পথ তৈরি করে দিয়েছেন যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সুখে স্বস্তিতে চলতে পারে। এ বড় সহজ কাজ নয়। আমি মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করি, যাকে 'বাইবেল বেল্ট' বলে। এখানে খুব গোঁড়া খ্রিস্টানদের বাস। আমি জানি এসব জায়গায় কাজ করা কখনও কখনও কী শক্ত হয়ে ওঠে।

সারা পৃথিবীর মানুষ, তারা প্রাচ্যের হোক বা পাশ্চাত্যের, তাদের চেহারা, দেহের রং, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম যতই আলাদা হোক, সব মানুষের শিরায় শিরায় সেই একই লাল রক্ত বইছে। আমরা যখন প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের কথা বলি তখন মনে রাখতে হবে, সত্য কখনও ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকতে পারে না, কম্পাসের যে-কোনও দিকেই যাওয়া যাক, সে অপরিবর্তিত। অভিকর্ষসূত্র আফ্রিকা বা এশিয়ার চেয়ে আমেরিকায় বেশি কাজ করবে না। রসায়নের তত্ত্ব ভারতীয় গবেষণাগারে যতটা সত্য, ইতালি বা কানাডার গবেষণাগারেও ততটাই। ৯ আগস্ট ১৮৯৫ স্বামীজী লিখছেন, ''প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলন্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ লোকে যাহাদিগকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণে'রই সেবক। যে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে জলসেচন করে, সে কি প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্ষটিতেই জলসেচন করে না?

''কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ কল্যাণের ভিত্তি একটিই আছে। সেটি—এইটুকু জানা যে, 'আমি ও আমার ভাই এক।' সর্বদেশে সর্বজাতির পক্ষেই একথা সমভাবে সত্য।''

স্বামীজী তখন কী করছিলেন? বেদান্ত আর্কাইভস্-এ আমি কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলাম। স্বামীজী এখানে এসে পৌঁছলেন জুলাই ১৮৯৩। ডিসেম্বর ১৮৯৫ অবধি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপশ্চিম অঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল জুড়ে বক্তৃতা করলেন। সেইসময়ে তাঁর বক্তৃতার কোনও লিখিত নথি নেই। কেবল খবরের কাগজের কিছু বিবরণী আর কিছু ব্যক্তিগত পত্র। সেসব বাণী হারিয়ে গিয়েছে। আমেরিকাবাসীরা ভাবলেন এই অপূর্ব মানুষটির বার্তা আমাদের সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। ডিসেম্বর ১৮৯৫ তাঁরা জে জে গুডউইনকে স্টেনোগ্রাফাররূপে নিয়োগ করলেন। স্বামীজী তখন নিউইয়র্কে। একটি বছরে স্বামীজী যা করেছেন আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না। তিনি সপ্তাহে চোদ্দোটি করে ক্লাস নিচ্ছিলেন! ক্লাস আর বক্তৃতা। আলসিঙ্গা পেরুমলকে তিনি লিখেছেন : ''অন্য কোনও হিন্দু আমার মতো কাজ করলে রক্তবমি করে মারা যেত।'' স্বামীজী আমাদের জন্য তাঁর রক্ত দিয়েছেন। আমাদের সবার জন্য তাঁর জীবন দিয়েছেন। সেইজন্যই এত অকালে তাঁর মৃত্যু। প্রজন্মের পর প্রজন্ম আসবে এবং মনে রাখবে স্বামীজী আমাদের কী দিয়েছেন, কী তাঁর অবদান।

মানুষ যখন আমায় জিজ্ঞেস করেন, ''বিবেকানন্দের প্রধান অবদান কী?'' আমি বলি, ''আমার মতে চারটি যোগগ্রন্থ তাঁর মূল অবদান। ওগুলো যদি আপনি পড়েন, আপনি জেনে যাবেন ধর্ম কী। কেউ আর আপনাকে ভুল বোঝাতে বা ঠকাতে পারবে না।'' স্বামীজী এক অসাধারণ পুরুষ। যাঁরা শংকরাচার্যের উপনিষদের, গীতার ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য পড়েছেন তাঁরা জানেন সেসব বোঝা কত শক্ত। আপনার যদি ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য আর অন্যান্য মতের ব্যাখ্যা না জানা থাকে তাহলে শংকরাচার্যের উত্তর আপনি বুঝতে পারবেন না। কিন্তু স্বামীজী সে-পথে যাননি। তিনি প্রতিভাবান মানুষ। তিনি উপনিষদ এবং বেদান্তের নির্যাসটুকু গ্রহণ করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায়। ফলে কত সহজে তাঁর বাণী বোঝা যায়! ঈশোপনিষদের 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং'—এ-জগতের সবকিছু ঈশ্বরের দ্বারা ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে—বেদান্তের এই অপূর্ব বাণী তিনি 'God in Everything' বক্তৃতায় কী সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন!

মনে পড়ে ১৯৭৫ সালে হলিউডে আমি ঈশারউডকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''আপনি স্বামীজীর ওপর একটা বক্তৃতা দিচ্ছেন না কেন?'' তিনি বললেন, ''না, আমি স্বামীজীর বক্তৃতা পাঠ করে শোনাব।'' প্রভবানন্দজী যখন অসুস্থ ছিলেন তখন রবিবারে তিনি স্বামীজীর একটি বক্তৃতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। তিনি বলতেন, ''আমি যখন বাড়িতে একা থাকি তখন উচ্চস্বরে স্বামীজীর লেখা পাঠ করি। তখন আমি স্বামীজীর উপস্থিতি অনুভব করি। তাঁর শব্দের পেছনে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি।''

স্বামীজী আর কী করেছেন? তিনি ধর্মের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। ''পুরাতন ধর্মে বলা হত, সে নাস্তিক যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। নূতন ধর্ম বলছে, সে নাস্তিক যে নিজেকে বিশ্বাস করে না।'' মানুষের মধ্যে সুপ্ত দেবত্বকে জাগিয়ে তোলাই ধর্ম। ধর্ম হল হওয়া এবং হয়ে ওঠা। ধর্ম হল উপলব্ধি। পাশ্চাত্যের মানুষের জন্য স্বামীজী ধর্মের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন। ধর্মমহাসভায় তিনি এক অপূর্ব ঐকতান সৃষ্টি করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বমানব। ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ আলাসিঙ্গাকে তিনি লেখেন : ''আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের।... কোন দেশের আমার উপর বিশেষ দাবি আছে? আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস না কি?''

স্বামীজী ছিলেন মানবজাতির মহান প্রেমিক। ১৯০০ সালে সানফ্রান্সিসকোয় তিনি এক ভদ্রমহিলাকে বলেন, ''আমায় হয়ত আবার জন্ম নিতে হবে।'' ''কেন স্বামীজী ?'' ''কারণ আমি মানুষের প্রেমে পড়ে গেছি।'' স্বামীজীর এই বিশ্বপ্রেম আমাদের স্পর্শ করে। প্যাসাডেনার শেক্সপিয়র ক্লাবে স্বামীজী তাঁর 'বৌদ্ধভারত' শীর্ষক বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন, ''আজ হয়তো আপনারা আমাকে অভিসম্পাত দিচ্ছেন, কিন্তু একদিন আমাকে আশীর্বাদ করবেন। আর যদি দীর্ঘজীবী হন তাহলে দেখবেন মানুষ আমাকে ঈশ্বর বলে পূজা করছে।'' সত্যিই তাই ঘটেছে।

আমি যখন হলিউডে গেলাম ১৯৭১ সালে, অনেকে এসে বলতেন (তখন সেখানে হিপি আন্দোলন চলছে), ''বেদান্তের ওপর কোনও বই দিতে পারেন?'' কী বই দেওয়া যায়? নবাগতের কাছে উপনিষদ বা গীতা দিয়ে কোনও লাভ নেই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত খুলে যেই তারা পড়বে ''Women and gold are maya''—'কামিনীকাঞ্চনই মায়া', অমনি তারা বই বন্ধ করে দেবে। আমি একবার এক কপি কথামৃত এক ভদ্রমহিলাকে পড়তে দিয়েছিলাম। যে-মুহূর্তে তাঁর চোখে পড়েছে 'কামিনীকাঞ্চন মায়া', তৎক্ষণাৎ তিনি বইটি বন্ধ করেছেন এবং তাঁর ইচ্ছাপত্রে লিখে গেছেন, ''আমি মারা গেলে এই বইটি অনুগ্রহ করে মহারাজকে ফেরত দিয়ো।'' তিনি মারা গেলেন আর তাঁর বোন বইটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কাজেই আমরা দেখলাম আমাদের বেদান্তের ওপর একটা বই বার করতে হবে। তাই আমরা প্রকাশ করলাম 'বেদান্ত : মুক্তির বাণী'। এই বই স্বামীজীর বাণী ও রচনার নির্যাস : বেদান্ত কী, বেদান্তদর্শন, বেদান্তধর্ম, বেদান্তে ঈশ্বর ও মানব, মায়ার ধারণা, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, বেদান্তের লক্ষ্য, বেদান্তের প্রয়োগ, আর বেদান্তের সর্বজনীনতা। বারোটি অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়গুলি সাজালাম। বইটি খুব জনপ্রিয় হল। জার্মান, ডাচ, স্প্যানিশ, কোরেশিয়া, লিথুয়ানিয়া ভাষায় এটি অনূদিত হল। এখন একজন এটিকে

পর্তুগিজ ভাষায় অনুবাদ করছেন। বাংলায় এর নাম হয়েছে 'বেদান্ত : মুক্তির বাণী'। বইটি যখন জার্মানিতে গেল, ওরা ভাবল, 'মুক্তি'-র কোনও রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকতে পারে। তাই তারা বইটার নাম বদলে করে দিল 'বেদান্ত : প্রজ্ঞার সমুদ্র'। ভারি সুন্দর শিরোনাম।

রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন, ''সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ যেকথা বলেছিলেন তা হল, সব ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে এক ঈশ্বর রয়েছেন, সব ধর্মের ঊর্ধ্বে এক ধর্ম। আমাদের যাবতীয় ধার্মিকতা, যাবতীয় ভগবদ্ভক্তি, সংস্কার, অনুশাসন, মতবাদ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে একটা কিছু আছে। আর তা হল সেই ধর্ম যা প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন ঘটাতে পারে।''

এ-ঘটনা সত্যিই ঘটছে। ইংল্যান্ডে ডন কিউপিট 'The Sea of Faith' নামে একটা বই লিখেছেন। তিনি বলেছেন, ''একবিংশ শতাব্দীতে চার্চের পক্ষে doctrine ও creed (নীতিকথা আর অনুশাসন) দিয়ে ধর্মকে ধরে রাখা অত্যন্ত শক্ত হবে।''

স্বামীজীর একটা স্বপ্ন ছিল। গোটা বিশ্বকে তিনি কীভাবে মেলাতে পারেন সে-বিষয়ে তিনি এক বক্তৃতায় বলেছেন, ''আমার প্রত্যয়ের কথা শুনবে? পৃথিবীতে আজ যত সভ্যতা বিরাজ করছে তারা প্রায় সবাই একটি বিশেষ মানবজাতি থেকে উদ্ভূত—সে হল আর্যজাতি। আর্য সভ্যতার তিনটি ভাগ : রোমান, গ্রিক এবং হিন্দু। রোমান ধারার মধ্যে রয়েছে সংগঠন, দখলদারি, একাগ্রতা; কিন্তু কমতি রয়েছে আবেগের, সৌন্দর্য উপভোগের এবং উচ্চস্তরের হৃদয়োচ্ছ্বাসের। নৃশংসতা এই ধারার মূল ত্রুটি। গ্রিকরা সুন্দরের প্রতি অতীব অনুরক্ত, কিন্তু তাদের অগভীর এবং অনৈতিক পথে ঝোঁকার প্রবণতা রয়েছে। হিন্দুরা সার্বিকভাবে তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ এবং ধর্মভাবাপন্ন, কিন্তু তাদের মধ্যে সংগঠন ও কর্মের অভাব। বর্তমানে রোমান ধারার প্রতিনিধিত্ব করে অ্যাংলো-স্যাক্সন, গ্রিক ধারা মূলত ফরাসিরা। আর প্রাচীন সেই হিন্দুদের মৃত্যু নেই। প্রস্তাবিত এই নতুন জমিতে প্রতিটি ধারারই নিজস্ব উপযোগিতা রয়েছে। সেখানে রয়েছে রোমানদের সংগঠন, গ্রিকদের সুন্দরকে ভালবাসার আশ্চর্য শক্তি আর হিন্দুদের ধর্ম আর ভগবদ্প্রেমের মেরুদণ্ড। এদের একসঙ্গে মিলিয়ে নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটাও।''

বিবেকানন্দ ভবিষ্যতের ধর্মকে মানসচক্ষে দেখেছিলেন। প্রথমে বিজ্ঞান আর ধর্ম মিলিত হয়ে করমর্দন করবে, কাব্য আর দর্শন বন্ধুত্ব পাতাবে, যুক্তি আর বিশ্বাস একে অপরকে আলিঙ্গন করবে এবং হৃদয় আর বুদ্ধি চিরকালের জন্য তাদের বিবাদ ভুলে যাবে। স্বামীজীর বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে।

উপনিষদে সেতুর উল্লেখ আছে। মুণ্ডকে আছে, 'অমৃতস্যৈষ সেতুঃ'—অমৃতত্বলাভ করবার সেতু বা উপায় হচ্ছে আত্মাকে জানা। ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে ব্রহ্মসেতুর উল্লেখ আছে। এই সেতু বা বাঁধ জীবজগতকে ধরে রয়েছে।

জাগতিক বস্তুর দ্বারা তৈরি সেতুতে ফাটল ধরে বা ভেঙে যায়। কিন্তু স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে চিন্তার, ভাবের, প্রেমের ও আধ্যাত্মিকতার সেতু সৃষ্টি করে গেছেন।

ভগিনী নিবেদিতা ১১ এপ্রিল ১৯০৬ জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন, ''দেখো, আমরা যারা স্বামীজীকে দেখেছি, মনে রেখেছি, সেই আমরা যখন মারা যাব তখন এক দীর্ঘ সময় ধরে চলবে বিস্মরণ আর স্তব্ধতা। মনে হবে যেন তাঁর কাজ সবাই ভুলে গেল। তারপর দেড়শো বা দুশো বছর পর হঠাৎ দেখা যাবে, স্বামীজীর প্রভাব পাশ্চাত্যকে বদলে দিয়েছে।''

আমি খুব আশাবাদী মানুষ। আমি বিশ্বাস করি, স্বামীজীর জীবন ও বাণী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শান্তি ও মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করবে।

অনুবাদ : দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত